বাংলার পথ পরিচিতি (মধ্যযুগ)

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

মানব সভ্যতা উন্মেষের অন্যতম প্রধান বাহন হল পথ এবং পথকে অবলম্বন করেই উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একে অপরের সঙ্গে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বানিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও চিন্তাশক্তি আদান প্রদান করতে সক্ষম হওয়ার এক অখন্ড জনপদের সভ্যতার বিকাশলাভ সম্ভবপর হয় । প্রাচীন সাহিত্যে ভারতবর্ষকে দু'ভাগেবিভক্ত করা হয়েছিল, যথা --- উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। উত্তরাপথের পূর্বভাগে মগধ, অঙ্গ, রাঢ়, পৌন্ড্রবর্ধন, কামরূপ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনপদ এক অপরের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক, বানিজ্যিক ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে নিকটতর হয়েছিল। সুদূর অতীতে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক বৃহৎ অঞ্চলের সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক পর্বের গোড়ারদিকে অখণ্ড বঙ্গদেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতীতের রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বরেন্দ্রভূমি চতুর্দশ শতকে একত্রে 'বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীনপর্বে বঙ্গদেশের পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল স্থলপথ ও জলপথ। তবে পথ পরিচিতি অর্থে প্রধানত স্থলপথকেই বোঝায়। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক প্রকার পথের উল্লেখ আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'দেবপথাদিভ্যশ্চ' (৫/৩/১০০) অর্থে হংসপথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, সিংহপথ, সিংহগতি, উষ্ট্রগ্রীব, হস্ত দন্ত, ইন্দ্র, পুষ্প, জলপথ ও রজ্জুপথকে নির্দেশ করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১/১/৪৯) কণ্ডারপথিক বারিপথিক, স্থলপথিক ও রথ্যা (শকটাদির পথ) প্রভৃতি পথের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২২ প্রকরণ) স্থানীয়, রাষ্ট্র, বিবী, সংবাহনীয়, ব্যূহপথ, গ্রামপথ, হস্তিপথ, গোপথ, রথপথ, পশুপথ ও মনুষ্যপথ নির্মাণের কথা জানা যায়। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব ভারতে রেলপথ প্রচলনের পূর্বে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ, গোযান, মহিষযান ওমানব বাহিত হয়ে সমরোপকরণ, বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি, ও মানুষকে স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হত। রেলপথ ও মোটর যান প্রবর্তনেরফলে পথঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে একালে পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব এসছে।

এদেশের সমাজ, সাংস্কৃতি ও ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রয়াত ডঃ হিতেশ রঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন, 'রাঢ় জনপথ লোহা ও তামার মত অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎস স্থল। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক যুগে অনুর্বর, জঙ্গলময় উচচাবচ রাঢ়ভূমি চারদিক থেকেইস্থায়ী বসতি সম্পন্ন উর্বরভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৃতীয়তঃ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তো বটেই, তার পরেও রাঢ় বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ বলে গণ্য হত। পশ্চিমে উত্তর ভারত থেকে এবং দক্ষিণে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপেরযোগাযোগ হ'ত রাঢ়ের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার, সার্থবহ চলাচল হয়েছে রাঢ়ের পথ বেয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে মার্গ সংস্কৃতির প্রভাবও এসেছে এই পথেই।' বরেন্দ্রভূমির সঙ্গে পশ্চিম ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মিথিলা, ত্রিহুত ও দ্বারবঙ্গের মধ্য দিয়ে এবং এই পথেই কামরূপ, প্রাগ্ জ্যোতিষপুর ও বঙ্গ -এর (পূর্ববঙ্গ) যোগাযোগ ছিল। মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বরেন্দ্রভূমি, সমতট ও বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল রাঢ়ের মধ্য দিয়ে।

পাল ও সেন আমল ছিল বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণময় যুগ। এই সময়ে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা - বানিজ্য ও পথঘাটের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। পাল সম্রাটগণ সমগ্র বঙ্গদেশের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করেছিলেন। উন্নত যোগাযোগ

ব্যবস্থা ব্যতীত এই বিরাট জনপদের উপর ৪০০ বছর ধরে একাধিপত্য ও সুশাসন সম্ভবপর ছিল না। রামচরিতে বর্ণিত আছে, দণ্ডভূক্তি, দেবগ্রাম, অপারমন্দার, কুজবটি, তৈলকম্প, ঢেক্করী, সঙ্কটগ্রাম, শিখরভূম, নিদ্রাবল, উচ্ছাল প্রভৃতি অঞ্চলের রাজন্যবৃন্দ সমবেত হয়ে রামপালের সাহায্যার্থে বরেন্দ্রভূমির অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে এরূপ বিরাট সামরিক অভিযান সম্ভবপর হত না। চন্দেলরাজ ধঙ্গদেব, রাজেন্দ্র চোল ও কর্ণদেবের সময় অভিযান হতে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের যথোপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। হাজারিবাগ জেলার দুধপানি পাহাড়ে খোদিত শিলালিপি হতে অনুমান করা যায় যে অযোধ্যা হতে মনের, পালামৌ , হাজারিবাগ,মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত একটি বানিজ্যপথ ছিল। পাল আমলের চতুরঙ্গ বাহিনী (রামচরিত ২/৭) ব্যতীত মহিষারোহী (রামচরিত - ৩/৩০) সৈন্যবাহিনীর উল্লেখ আছে। ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণ অশ্ব ও হস্তী ব্যবহার করতেন এবং পুরনারীগণ পাল্‌কি চেপে স্থানান্তরে যাতায়াত করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ মহিষ - বাহিত গাড়ীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে মহিষের ব্যবহার অন্যতম প্রধান সম্বল ছিল।

একাদশ শতকের একটি শিলালিপিতে প্রাচীন পথ নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে গ্রথিত শিলালিপিতে রাজা হরি বর্মাদেবের মহামন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশস্তিলিপিতে উল্লেখিত আছে যে ভবদেব রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি রাঢ় দেশে একটি জাঙ্গল বা পথ নির্মাণ করেন। প্রশস্তিলিপি হতে জানা যায় ---

'রাঢ়ায়াম্ জলাসু জঙ্গল পথ গ্রামোপকণ্ঠস্থলী --
সীমাসু শ্রম মগ্নপান্থ পরিষৎ প্রাণাশ্য প্রীণনঃ !'

(অনু রাঢ়দেশে জাঙ্গাল পথযুক্ত ও জলহীন গ্রামোপকণ্ঠ সীমায় শ্রমার্ত পান্থদের প্রীতি-দায়ক জলাশয় ইনি (ভবদেব) প্রতিষ্ঠা করেছেন।) অতীতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের পথঘাট নির্মাণ ও জলাশয় খননের প্রথা ছিল। কোন কোন অভিলেখে বাহনায়কের পরিচয় জানা যায়, যিনি ছিলেন পরিবহন ব্যবস্থার পদস্থ কর্মচারী।

বল্লাল সেনের একাদশ রাজ্যাঙ্গে (১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সম্পাদিত নৈহাটী তাম্র শাসনের উল্লিখিত কয়েকটি গোপথ বর্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানায় অবস্থিত ছিল এবং তাম্র শাসনে খোদিত গোপথগুলি গ্রামের সীমানাকে চিহ্নিত করত বলে অনুমান করা যায়। লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্র শাসনে উল্লিখিত 'বেতড্ড-চতুরক' বানিজ্যকেন্দ্র ও শাসন কার্যের একটি গুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং এই বানিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চয়ই ছিল।

১২০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার - উদ্ - দীন মোহম্মদ বখতিয়ার খলজি নোদিয়াহ্ বা নবদ্বীপ জয় করেন। মনে হয় তিনি পাল- সেন আমলের রাস্তা অনুকরণ করেন আরোহী সৈন্যবাহিনীসহ প্রথমে নোদীয়াহ্ ও পরে গৌড় জয় করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতে ইখতিয়ার-উদ্- দীন ঝাড়খণ্ডের উত্তরাঞ্চল ধরে বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে নদীয়া আত্রমন ও অধিকার করেন। কিন্তু কেহ কেহ মন্তব্য করেছেন যে ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে নদীয়া অভিযান সম্ভব ছিল না। তাঁরা গঙ্গা নদীর উত্তর অঞ্চল হয়ে অভিযানের কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রিহুত জয় না করে ঐ পথে আসা সম্ভবপর নহে। ত্রিহুত দীর্ঘ দিন স্বাধীনছিল।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঐতিহাসিক - ভূগোল আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই বিশাল অঞ্চলটি তিন ভাগে বিভক্ত এবং সমগ্র ঝাড়খণ্ড গভীর অরণ্য অধ্যুষিত ছিল না। প্রাচীন চেরো জাতি ঝাড়খণ্ডের উত্তর - পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করত। মগধ ও তার দক্ষিণাঞ্চলে কিকট জাতির বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে শিশুনাগ বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে এতদঞ্চল সভ্যতার চরম শিখরে উপনীত হয়। এই অঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিকগণের মতে পশ্চিমে রোহটাগড় হতে পূর্বে দেওঘর - বৈদ্যনাথ ধামের সীমা পর্যন্ত উত্তর ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগে নবদ্বীপ, কাটোয়া, রাজনগর, বৈদ্যনাথধাম, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগৃহ হয়ে গয়া পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের একটা পথ ছিল। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের বিবরণ হতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য গয়াধাম হতে উত্তর ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত পথ অনুসরণ করে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। ইখতিয়ার - উদ্-দীন বিহার সারিফ হতে মুঙ্গের ওভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়ে দেওঘরে এসে তথা হতে বীরভূম জেলা অতিত্রম করে মঙ্গলকোটে অজয়নদ পার হয়ে সম্ভবত সসৈন্যে নদীয়া নগরে উপস্থিত হন।

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বিবররণ হতে জানা যায় যে ঝাড়খণ্ডের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল অতিত্রম করে বঙ্গদেশ ও

ওড়িশায় কয়েকটি বড় বড় সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আনুমানিক ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ বিহার সরিফ হতে পাঁচেৎ হয়ে খিচিং-এ উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে জাজনগর, কটক ও পুরী আক্রমণ ওলুণ্ঠন করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া অভিযানের পথে শেরশাহ পূর্ব - বিহারের সুরজগড় হতে সোজা গৌড়ের পথে না গিয়ে বীরভূম জেলার নগোর অতিক্রম করে গৌড় আক্রমণ করেন। অপরপক্ষে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজমশাহ অগ্রবর্তী খাঁটি তেলিয়াগড়ির গিরিবর্তে সসৈন্যে শেরশাহকে বাধা প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুলোমান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড় বা রাজু তাণ্ডা হতে বীরভূম ও পূর্ব ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে ময়ুরভঞ্জ জয় করার পর পুরী আক্রমণ ও অধিকার করেন। আকবরনামায় বর্ণিত আছে যে ওড়িশার পাঠান শাসনকর্তা কতলু খাঁ লোকহানীকে দমনের নিমিত্ত মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ ভাগলপুর হতে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হন এবং তথা হতেগড় মান্দারণ হয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে সসৈন্য কটক অভিমুখে ধাবিত হন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আাওরঙ্গজেব সুলতান সুজার বিদ্ধে সেনাপতি মিরজুমলা ও শাহজাদা মোহাম্মদ সুলতানকে প্রেরণ করেন। মিরজুমলা তেলিয়াগড়িতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শাহজাদামোহাম্মদকে অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ সুরজগড়ে রেখে স্বয়ং মুঙ্গের হতে দশদিনে বীরভূম জেলার সিউড়িতে উপস্থিত হন এবং পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণের আশঙ্কায় সুলতান সুজা তেলিয়াগড়ির নিকট গঙ্গা পার হয়ে গৌড়ে পলায়ন করেন।

আরও পরবর্তীকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ৪০ হাজার আরোহী সৈন্যসহ ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর রাম কোলহাতকার এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যসহ রঘুজী ভোঁসলে নাগপুর হতে দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড অঞ্চল অতিক্রম করে পাঁচৎ হয়ে বর্ধমান ও কাটোয়ায় উপস্থিত হন। ঐ বৎসর নবাব আলিবর্দীর অনুরোধে পেশোয়া বালাজী রাও রঘুজী ভোঁসলেকে বাধা দেওয়ার জন্য লক্ষাধিক আরোহী সৈন্যসহ বারানসী, সাসারাম, দাউদনগর, টিকারী, গয়া, মানপুর, বিহার শরিফ, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা হয়ে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন। একখানি উৎকৃষ্ট সার্ভে মানচিত্র পর্যালোচনা করলে বিহার হতে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে আগমনের সকল সংশয় দূর হবে।

ডঃ আবদুল করিম ত্রয়োদশ শতকে উত্তরবঙ্গে কয়েকটি পথের সন্ধান দিয়েছেন। 'সবচেয়ে উত্তরদিকের রাস্তাটা লখনৌতি হতে উত্তরদিকে গিয়া মালদহ ও দিনাজপুরের ভিতর দিয়া নেকমর্দন ও গোবিন্দনগর হইয়া পূর্বদিকে মোড় নেয় এবং রংপুর জেলার ভিতর দিয়া কোচবিহার হইয়া আসামের রাঙামাটি পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান হতে আসামের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় রাস্তাটি লখনৌতি হতে বাহির হইয়া দেবকোট, দিনাজপুর, রংপুর ও কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়া রাঙ্গামাটিতে গিয়া মিশিয়াছে। তৃতীয় রাস্তাটি রাঙামাটি হতে নিশানপুর এবং সেখান থেকে বালুরঘাট, ঘোড়াঘাট ও উলিপুর হইয়া কুড়িগ্রাম গিয়া দ্বিতীয় রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। চতুর্থ একটি রাস্তা তৃতীয় রাস্তা হতে নিশানপুরে বাহির হইয়া মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ও বর্দ্ধনকুঠি হইয়া আবার তৃতীয় রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। এছাড়া লখনৌতি হতে একটা রাস্তা সোজা বর্দ্ধনকুটি পর্যন্ত গিয়েছিল।

মিনহাজ - উদ্ - দীনের তবকাত - ই - নাসিরী গ্রন্থে একটা পাথরের সেতুর উল্লেখ আছে। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসেবখতিয়ার খলজি তিববত অভিযানের সময় কামরূপ রাজ্যের রাঙামাটিতে একটি পাথরের সেতু পার হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় কামরূপ সৈন্য কর্তৃক ঐ সেতু ধবংস করার ফলে প্রায় সমুদয় মুসলমান সৈন্য নিহত হয়। কানাই - বড়শীর কাছে সিলহাকোপুল (পাথরের সেতু) ধবংস করা হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে একখানি শিলালিপিতে, ---

'শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে
কামরূপং সমাগত্য তুরষ্কা ক্ষয়মায়যু।'

১১২৭ শকের ১৩ই চৈত্র (১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ) কামরূপে সমাগত তুরষ্কগণ বিধবস্ত হয়।

তবকাত - ই - নাসিরীতে উল্লিখিত আছে যে গিয়াসউদ্দীন ইউজ খলজী (১৩১৩-২৭ খ্রিস্টাব্দ) একটি বড় রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। 'লাখনৌতি (লক্ষ্মণাবর্তী) থেকে লাখনোর (নগোর, জেলা বীরভূম) দ্বার পর্যন্ত এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে দেবকোট পর্যন্ত উঁচু রাস্তা নির্মিত ছিল। এগুলি প্রায় দশদিনের পথ। তিনি এগুলি নির্মাণ করেছিলেন, এ কারণে যে বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চল পাণিতে ডুবে যেত। যদি এই উঁচু রাস্তাগুলি না থাকত তবে নৌকা ব্যতীত গন্তব্যস্থল ও গৃহাদিতে যাওয়া

সম্ভব হত না। তাঁর সময়ে এই উঁচু রাস্তা সমূহ নির্মিত হবার ফলে সমস্ত লোকের (চলাচলের) পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।' (তককাত পৃ ৫৯) ১৩২১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রামে প্রাপ্ত গিয়াসউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত একটি খানকাহ (ধর্মশালা), দরগা ও মসজিদ নির্মাণ হতে প্রমাণিত হয় যে কোন রাস্তার ধারে ধর্মশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবত নগোর - সিয়ান ও মঙ্গলকোটের যোগাযোগ রাস্তার উপর ধর্মশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দীন ইয়জ শাহের রাজত্বকালে উৎকলরাজ অনঙ্গ ভীমদেব রাঢ়দেশ অধিকার করে নগোর অবরোধ করেন। মুসলমান সৈন্য লখনৌতি হতে নগোর - সিয়ান - মঙ্গলকোট - দিগনগর হয়ে দামোদরের দক্ষিণ তীরে বাঁকুড়া জেলার কাটাসিন দুর্গে অবস্থানরত উৎকল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিল। অনেকে সোনামুখী হতে কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বর্তমান কাষ্ঠমাঙ্গাকে কাটাসিন বলে সনাক্ত করেছেন। গঙ্গা সৈন্য জাজনগর হতে অগ্রসর হয়ে তাম্রলিপ্ত ও অরম্যনগরী (গড় মান্দারণ) অধিকারের পর দামোদর নদ পার হয়ে উত্তর রাঢ় অভিযানে অগ্রসর হয়েছিল । এই অভিযান দীর্ঘস্থায়ী ছিল। বর্ধমান জেলার রায়না থানায় ও বাঁকুড়া জেলায় 'উড়ের গড়' নাকম স্থানদ্বয়ে বিজয়ী গঙ্গাসৈন্যের শিবির ছিল বলে এরূপ জনশ্রুতি আছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে সমগ্র রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে ৩য় অনঙ্গ ভীমদেব শ্রীক্ষেত্র থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। এর ফলে গৌড়ের সঙ্গে কম দুরত্বের পথে শাসনকার্য, সমরাভিযান ও তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত এই পথটি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়ে মধ্যযুগ হতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

মুখিস উদ্দীন ইউজবক কামরূপ অভিযানের পর প্রত্যাবর্তনের সময় আরোহীবাহিনী বেকায়দায় পড়ে। সুলতানের আদেশে একজন স্থানীয়লোককে ধরে তাকে দেবকোটের রাস্তা দেখাতে বাধ্য করা হয়। লোকটি মুসলমান বাহিনীকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি সোজা রাস্তায় দেবকোটের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মুখীস - উদ্ - দীন তুগরলের বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান গিয়াস - উদ্- দীন বলবন তিন লক্ষ সৈন্য সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ তুগরলের পশ্চাৎ ধাবন করে বিদ্রোহ দমন করেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশের গুত্বপূর্ণ স্থানগুলির যোগাযোগের জন্য বিজিত হয়েছিল। সম্ভবত এই সময়ে রাজধানী দেবকোটের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য গৌড় - জাজনগর রাস্তার শাখা বর্ধমান - সপ্তগ্রাম যুক্ত হয়েছিল। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে গিয়াস-উদ্-দীন তুগলক বঙ্গদেশ জয় করে এদেশকে তিনটি শাসন বিভাগে বা ইক্তায় বিভক্ত করেন --- লখনৌতি, সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁও। সোনারগাঁও -এর শাসন কর্তা ফকর - উদ্ - দীন মুবারক শাহ শ্রীপুরের বিপরীত তীরে অবস্থিত চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তৈরী করেন। বিংশ শতকেও এই রাস্তার কিছু অংশ 'হদ্দীনের পথ' (ফরক - উদ্ - দীনের পথ) নামে নোয়াখালী - ত্রিপুরা অঞ্চলে পরিচিত ছিল।

পূর্ববঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে বহু বড় বড় ও খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হওয়ায় প্রাচীন রাজপথগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে।অপরপক্ষে রাঢ় অঞ্চলের শক্ত ও রূঢ় - ক্ষ মাটিতে প্রাচীন রাজপথগুলি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। স্বাধীন সুলতানী আমলে হিন্দু রাজাদের নির্মিত রাস্তাগুলিকেই সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছিল। গৌড়ের সুলতানদের সঙ্গে ওড়িশার হিন্দু রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগে থাকত। বঙ্গদেশে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার দক্ষিণ অংশ ওড়িষ্যার অধীনস্থ ছিল। আরম্যনগরী (গড় মান্দারণ) হোসেন শাহের পূর্ব পর্যন্ত ওড়িশার অধীনস্থ ছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন বিশাল ছিল। গৌড় হতে দক্ষিণমুখী ব্রাহ্মণভূম পরগণার নেড়াদেউল পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথটি হোসেন শাহের নির্মিত দক্ষিণমুখী ব্রাহ্মণভূম পরগণার নেড়াদেউল পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথটি হোসেন শাহের নির্মিত 'বাদশাহী সড়ক' নামে বহুল প্রচারিত। এই সড়কটি মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে নেড়াদেউলে ওড়িশামামী রাজপথের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। রাস্তার ধারে পুষ্করিণী ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। প্রবাদ ও স্থানীয় জনশ্রুতিতে বাদশাহী সড়ক ধরে পুষ্করিনী ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। প্রবাদ ও স্থানীয় জনশ্রুতিতে বাদশাহী সড়ক হোসেন শাহের নির্মিত বলে প্রচলিত হলেও এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। অতীতে পাটলীপুত্র হতে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত একটি বানিজ্যপথ ছিল। মহাবংশে উল্লিখিত আছে সম্রাট অশোক বোধিবৃক্ষির শাখাকে বিদায় জানাতে স্থলপথে তাম্রলিপ্ত এসেছিলেন এবং জলপথে বোধিবৃক্ষের শাখাটিকে বন্দরে নিয়ে আসা হয়েছিল। অনন্ত চোড় গঙ্গা, প্রথম

নরসিংহদেব ও ৩য় অনঙ্গ ভীমদেব প্রাচীন কালে নির্মিত রাজপথ ধরে রাঢ় অভিযানে এসেছিলেন। সামরিক প্রয়োজনে ৩য় অনঙ্গভীমদেব জাজনগর হতে বর্ধমান পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার সাধন করেন এবং কোন এক সময়ে উত্তর রাঢ়ে গিয়াস - উদ্ - দীন ইউজের নির্মিত রাস্তার সঙ্গে পূর্বোক্ত রাজপথটি মিশে যায়। পূর্ববর্তী হিন্দু রাজাদের ও ত্রয়োদশ শতকে স্বাধীন সুলতানগণের আমলের রাজপথটি হোসেন শাহের আমলে উত্তমরূপে সংস্কার করা হয়েছিল এবং এই রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী ও মসজিদ নির্মাণ করায় হোসেন শাহের অক্ষয় কীর্তি ঘোষিত হচ্ছে। এই রাস্তা হোসেন শাহের বহু পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর কোন কৃতিত্বই নেই।

ষোড়শ শতকে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থে কয়েকটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও চুড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়'-এ শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ হতে গয়া গমনের পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীগণ নবদ্বীপ হতে যাত্রা করে ইন্দ্রানী, কাটোয়া, নৈহাটী, চাকতা, আনখোলা, তিলপুর, রাউতারা, একডালা, গৌড়, মল্লাপাড়া, কানাইনাটশাল, তেলিয়াগড়ি ও গিরিদ্বার অতিক্রম করে প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগীর নগরে উপস্থিত হয়ে পরদিন গয়া গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে মন্দার পর্বত (ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহাকুমায়) ও বৈদ্যনাথ ধাম দর্শন করে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলা অতিক্রম করে ইন্দ্রানীতে (কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যবর্তী) উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রানীতে রাত্রিবাস করে পরদিন 'গঙ্গপার হয়্যা নবদ্বীপ প্রবেশিলা' সঙ্গও উল্লেখ করা যায় যে ষোড়শ শতকে গঙ্গা বা ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হতে গঙ্গার পূর্ব তীর ধরে আটিসরা হয়ে ছত্রভোগে পৌঁছান এবং নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চল হয়ে জল্পেশ্বর গমন করেন এবং তথা হতে পুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ ভিন্ন পথের বর্ণনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর ত্যাগ করে অম্বিকা - কালনা, বেড়া, কুলিনগ্রাম (দামোদর পার হয়ে) শিয়াখালা, তাম্রলিপ্ত গমন করেন এবং তথা হতে দক্ষিণ - পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়ে স্বর্ণনদী বা সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বারাশত, দাঁতন, জল্পেশ্বর, অমরাহ, বাঁলদা, রামচন্দ্রপুর, রেমুনা, সরোনগর, বাঙ্গালপুর, অসুরগড়, ভদ্রক, তুঙ্গদা, জাজপুর, পুষোত্তমপুর, পাটনা, আমরোল, কটক, একাম্র (ভুবনেশ্বর), কাইতিপাড়া, কমলপুর, কোনারক গমন করে এবংসর্বশেষে আঠারনালা ও নরেন্দ্র সরোবর দেখে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য ১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমীতে জননী ও জাহবী দর্শনের নিমিত্ত গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। জয়ানন্দের মতে শুভদিনে নীলাচল ত্যাগ করে একাম্র, কটক, ব্রহ্মপুত্র, তুঙ্গদা, ভদ্রক, অসুরগড়, সরোনগর, রেমুনা, বাঁশদহ, দাঁতন, জল্পেশ্বর, মন্দারণ, বর্ধমান হয়ে কবির পৈত্রিক বাসস্থান মাঞিপুর (আমাইপুর বা রামাইপুর) উপস্থিত হন। আমাইপুর হতে শ্রীচৈতন্য নদীয়ার নিকস্থ ফুলিয়ায় উপস্থিত হন। জয়ানন্দের বিবরণ অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত ফন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে (সিট নং ৭) বর্ণিত স্থানগুলি চিহ্নিত আছে।

প্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক ও জেলা গেজেটিয়ারে ভারতবর্ষের একটি গুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন রাজপথের উল্লেখ আছে। অনেকের ধারণা এই যে শিবপুর (জেলা হাওড়া) হতে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তাটি শেরশাহ নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রসিদ্ধ রাজপথটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত এবং দৈর্ঘ প্রায় ১৫০০ মাইল বা ২৪০০ কিলোমিটার। এই রাজপথের আদি নির্মাতা হিসাবে শেরশাহের নাম যুক্ত হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের বিদ্ধে জয়লাভ করে আগস্ট মাসে দিল্লী অধিকার পূর্বক শেরশাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের দিন গোলার আগুনে অর্ধদগ্ধ হয়ে ঐ দিন মধ্য রাত্রে শেরশাহ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর পাঁচ বছর রাজত্বকালের প্রায় সাড়ে তিন বৎসর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বিগ্রহে কেটেছিল। অবশিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে (১৮ মাস) ২৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরী করা সম্ভবপর ছিল না। এমনকি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যেও একাজ অসম্ভব। মনে হয় বিহার অঞ্চলে কয়েকটি প্রাচীন রাস্তার সংস্কার করে পথের ধারে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। তারিখ-ই - শেরশাহী গ্রন্থে এই বিস্তৃত রাস্তা নির্মাণের জন্য শেরশাহের কোন কৃতিত্বের দাবী করা হয়নি। তবে শেরশাহ দিল্লী হতে আটক (পাকিস্তান) পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত সুলতানী আমলের রাস্তাটি প্রথমে ফকির - উদ্ - দীন মুবারক শাহ তৈরী করেছিলেন।

শেরশাহ হাওড়া সপ্তগ্রাম - বর্ধমান - ধানবাদ - গয়া - সাসারাম - বারানসী - দিল্লী হয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

করেননি তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে। ১৭৮১খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও ক াউন্সিল কর্তৃক ২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোলকাতা হতে বারানসী পর্যন্ত রাস্তার প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু লন্ডনের ডিরেক্টর বর্গের ১৭৮২ খ্রিস্টাবেদর ২৮ শে আগস্ট তারিখের পত্রে জানা যায় যে, এই বিপুল খরচের প্রকল্পটি কে াম্পানির অনুমোদন লাভ করেনি এবং উক্তপত্রে কোলকাতা হতে চুনারগড় পর্যন্ত ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরী নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০ বৎসরের মধ্যে এই রাস্তার নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে এবং তৎকালে এটি মিলিটারী রোড নামে পরিচিত ছিল। সালকিয়া হতে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে বিহারের জৌনপুর অঞ্চল অতিক্রম করে এই পথে চুনারগড় যাওয়া যেত। কিন্তু দামোদর ও ধলকিশোর (দ্বারকেশ্বর) নদের বন্যায় রাস্তাটি প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত, তা বিভিন্ন সূত্রের সংবাদে জানা যায়। ঐ সময়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের অস্তিত্ব থাকলে 'মিলিটারী রোড' নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

পূবোক্ত রাস্তাটি ব্যবহৃত হতে শু হলেও বহুবিধ অসুবিধার জন্য অপর একটি রাস্তা নির্মাণের প্রযোজনীয়তা দেখা যায়। কেরী সাহেবের 'Good old Days of the Hon'ble John Company' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের জুল াই মাসে ব্যারাকপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই রাস্তাটি বর্ধমান পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলে দিল্লী পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই রাস্তাটির নির্মাণ কার্য হাজারীবাগ পর্যন্ত সমাপ্ত হলে, এটি New Line of Roads নামে পরিচিত হয়ে জনসাধারণ ও মিলিটারীর ব্যবহারোপযোগী হয়েছিল এবং পূবোক্ত রাস্তাটি 'Old Military Road' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মেজর ফ্রেড রবার্টস (Major Fred Roberts, V. C. - Dy. Quarter Master General, Fort William)-এর লিখিত এক বিবরণে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হতে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাস্তার উল্লেখ আছে। এই বিবরণেফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হতে গৌরহাটীর বিপরীত ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাস্তার উল্লেখ আছে। এই বিবরণের ফোট উইলিয়াম দূগ হতে গৌরহাটীর বিপরীত ভগ পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটি শেষ হয় এবং গৌহাটীতে নৌকাযে াগে ভাগিরথী নদী অতিক্রম করতে হত। তারপর বেগুলিয়া পর্যন্ত (বরাকর) ১৫৪ মাইল ৭ ফার্লং অতিক্রম করে ধানবাদ - গয়া - বারানসী - দিল্লী - আম্বালা আটক হয়ে পেশোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাস্তা তৈরীর জন্য জরিপ ক ার্য হতে জানা যায় যে, রানিগঞ্জ হয়ে গয়া পর্যন্ত কোন প্রাচীন রাস্তার নিদর্শন ছিল না। রেনেলের মানচিত্রেও কোন রাস্তার নিদর্শন নেই। তাহলে এই রাস্তা যে শেরশাহ নির্মাণ করেছিলেন তার কোন লিখিতপ্রমাণ বা ব্যবহারিক নিদর্শন নেই। প্রসঙ্গ ত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে শিবপুর থেকে গৌরহাটী পর্যন্ত রাস্তাটির ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কার্য শু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল বেন্টিকের আমলে। যে ভাবেই আলোচনা করা হোক না কেন শিবপুর হতে পেশোয়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে শেরশাহের (রাজত্বকাল ৫ বছর) কোন কৃতিত্ব নেই।

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে অনেকগুলি রাজপথের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল রাজপথগুলি কোন্ সময়ে বা কোন্ সাসক তৈরী করেছিলেন ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। কেবল মাত্র পথ ব্যবহারের সময় সংশ্লিষ্ট স্থাননাম হতে পথের বিবরণ জানা যায়। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে দাউদ খানের বিদ্ধে অভিযানের সময় মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁকে সহায়তা করার জন্য রাজা টোডরমল বর্ধমান হতে মোগলমারি - গড়মান্দারণ - বালি - দেওয়ানগঞ্জ ও খাটাল হয়ে চেতুয়ায় মুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হন। অত পর সম্মিলিত মোগলবাহিনী কোটালপুর - বাসুদেবপুর - কালিয়া - নবাবগঞ্জ - শ্য ামপুর - কেদার - পলাশপুর - নানজোড়া (নাহানজোড়া) হয়ে দাঁতন রেলস্টেশনের ১৪ কিলোমিটার পূর্বে তুর্কা - কসব ার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং এই যুদ্ধ মোগলমারি যুদ্ধ নামে খ্যাত। আকবরনামায় উল্লিখিত আছে যে ওড়িশার পাঠান শাসক কতলু খাঁকে বাধা দিতে মোগলবাহিনী তাণ্ডা হতে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে উপস্থিত হয় এবং ওইখানে তুমুল যুদ্ধ হয়।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ভন. ডেন. ব্রুকের অঙ্কিত মানচিত্রে একটি সুদীর্ঘ রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত মানচিত্রে ওড়িশা - সুবার কটক হতে ভদ্রক - মেদিনীপুর - বর্ধমান - গাজীপুর - অগ্রদ্বীপ - পলাশী - লালমালতি - কাশিমবাজার হয়ে সূতী পর্যন্ত পথটি বিস্তৃত ছিল। সূতীতে পথটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি শাখা উত্তরবঙ্গের দিকে ও অপর শাখাটি ধরে র

াজমহল - মুঙ্গের হয়ে পাটনা পর্যন্ত যাওয়া যেত। বর্ধমান শহর হতে দিগনগর হয়ে উত্তর-পশ্চিম মুখে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর হয়ে রাজনগর পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটির সঙ্গে কাশিমবাজার থেকে আগত অপর একটি রাজপথের সংযোগ সাধিত হয়েছিল। অত পর মিলিত রাস্তাটি দেওঘর - বিহার সরিফ হয়ে পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বর্ধমান শহর হতে সেলিমাবাদ-সপ্তগ্রাম - হুগলী (নদীপার হয়ে) চাঁদপাড়া - যশোহর - ভূষণা - সত্রাজিৎপুর পূর্বে ধল্লেরী ও লখিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ইদ্রকপুর পর্যন্ত একটি পথের সন্ধান জানা যায়, যার অনতিদূরে বল্লালসেনের প্রাসাদ বলে কথিত একটি ধবংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছিল। ভন. ডেন. ব্রুকের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে ওম্যালি মন্তব্য করেছেন, 'Two roads are entered on his map one, a padishahi or royal road, extending through Burdwan to Midanpore, and the other, a smaller road, which starting from Burdwan, passed through Salimabad and Dhaniakhali to Hooghly, The Former was an important military route, being used by troops in the rebellion of 1696, in the march of Shuja – ud – din to Murshidabad and in the wars of Ali Vardi Khan'.

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে স্থলপথে ধনপতির গৌড় যাত্রা প্রসঙ্গে পথপরিচিতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা হোসেন শাহের আমলে নির্মিত বলে কথিত বাদশাহী সড়কের ইঙ্গিত বহন করছে। মুকুন্দরামের বিবরণে উজানী - মঙ্গলকোট হতে গৌড় যাত্রাকালে ধনপতি সদাগর মজলিপুর (ভরতপুর থানা, জেলা - মুর্শিদাবাদ), বারকপুর, বালিঘাটা (রঘুনাথগঞ্জ থানা) ও শীতলপুরে (সম্ভবত বর্দমান সূতী) বড়গঙ্গা অতিক্রম করে গৌড় নগরে প্রবেশ করেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যান ভাগ পালযুগের ইতিহাস আশ্রিত হলেও ময়নাগড় হতে গৌড় পর্যন্ত যাত্রাপথটির যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে নেড়াদেউল হতে উত্তরাভিমুখে প্রসারিত রাজপথটি হল বাদশাহী সড়ক। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে রাজমহল (আকবর নগর) -এ রাজধানী স্থাপিত হলে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্ত বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে সুবা - ওড়িশা পর্যন্ত সুলতানী আমলের রাজপথটি মোঘল আমলে ব্যবহৃত হত। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল,', মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল', রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল', ময়ুর ভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে পথপরিচিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ঘনরামের বিবরণ অধিকতর বিস্তারিত হওয়ায় এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। শ্রীধর্মমঙ্গলের রচনাকাল হল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষপর্ব ও সুবে বাংলার নবাবী আমলে প্রারম্ভিক যুগ।

শ্রীধর্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের গৌড় যাত্রা ও লাউসেনের অপহরণের জন্য দক্ষিণ ময়না আগমনের সময় ব্যবহৃত রাজপথের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ময়নার ভৌগোলিক অবস্থিতি হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে কালিনী বা কাঁসাই নদীর তীরে। দক্ষিণ ময়না হতে বের হয়ে কেলেঘাই নদীর বিল বা জলাভূমি (পদ্মমার বিল) পেরিয়ে কাশিজোড়া - ধূলাডাঙ্গা-ব্রহ্মপুর (সম্ভবত নেড়াদেউল) - কোতলপুর (বর্তমান জেলার রায়না থানায়) - মোগলমারি - আমিল্যা - ব্যারাকপুরের খাল - উড়ের গড় - দামোদর নদ পার হয়ে -বর্ধমান (সরাই শহর) -কর্জন্য - মঙ্গলকোটে অজয়নদ অতিক্রম করে - রাজকোট (পরিচয় অজ্ঞাত) - সিমুলিয়া - জামতিজালন্দা - পাঁচপাড়া (মোত্তারপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, মনোহরপুর, পলাশপুর ও হাজিপুর একত্রে পঞ্চগ্রাম) - গোলাঘাট - শীতলপুর (সম্ভবত সূতী) - বড়গঙ্গা অতিক্রম করে গঙ্গাবাদী হয়ে গৌঢ় বা রমৌতি (রামাবতী) নগরে পৌঁছান যায়। ঘনরামের বিবরণের সমর্থনে রেনেল সাহেবের মানচিত্রে (সিট নং ৭ও৯) প্রদর্শিত পথটি তমলুক থেকে কাঁসাই নদী অতিক্রম করে ময়নাগড় - আমর্ষি - নারায়ণগড় - মেদিনীপুর - বানপুর - নেড়াদেউল - ক্ষীরপাই- জাহানাবাদ - মোগলমারি - বর্ধমান - কামনারা - মঙ্গলকোট - নয়াহাট - তারাপুর - শেখপুর - মির্জাপুর - জাঙ্গীপুর - সূতী - নবাবগঞ্জ - রোহনপুর - গৌড় (Ruins of Gour) বা রামাবতী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্গী হাঙ্গামার সময় আরোহী মারাঠা ও নবাব সৈন্যদলের গমনাগমনের নিমিত্ত যে সকল পথের সন্ধান পাওয়া যায় তা সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইউসুফ আলির বিবরণ হতে জানা যায় যে বর্ধমান হতে কাটোয়া ও কাটোয়া হতে দিগনগর পর্যন্ত পথ দুটি মরাঠাদের অধিকারে ছিল এবং মাটিয়ারী হতে আমানিগঞ্জ পর্যন্ত রাজপথটি নবাবের অধিকারভূক্ত ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সসৈন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ (বর্তমান জি.পি.ও ও পূর্ব - রেলের অফিস) থেকে নির্গত হয়ে হুগলীতে নদীপার হয়ে নায়াসরাই - অম্বুয়াকালনা - সমুদ্রগড় - জাহান্নগর (নবদ্বীপের পশ্চিমে) পাটুলী - পিলে - গাজীপুর হয়ে অগ্রদ্বীপে ভাগীরথী অতিক্রম করে ইংরেজ সৈন্য পলাশীতে উপস্থিত

হয়েছিল। সৈন্যদলের অপর একটি অংশ ক্লাইভের অধীনে ১৭ই জুন পাটুলীর শিবির হতে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হয়ে ১৯শে জুন শাঁকাই দুর্গ (কাটোয়ার বিপরীত তীরে অজয় নদের ধারে) অধিকার করার পর ২২শে জুন নদীপার হয়ে পলাশীর আম্রকাননে পৌঁছেছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মেজর এডামস্ সসৈন্য কলিকাতা থেকে হুগলী (ভাগীরথীর পূর্বকুল ধরে) - অম্বুয়া কালনা - সমুদ্রগড় - অগ্রদ্বীপ অগ্রসর হয়েছিলেন। কোলকাতা হতে পাটনা পর্যন্ত গমনাগমনের জন্য অপর একটি পথের সন্ধান জানা যায় - ফোর্ট উইলিয়াম - চুচুড়া - বর্ধমান - দিগনগর - আউসগ্রাম - কর্ণগড় - সুল - ইলামবাজার - দুবরাজপুর - নগোর (রাজনগর বা লখনোর) - দেওঘর - গিধোর - বিহারসরিফ - শাজাহানপুর হয়ে পাটনা পর্যন্ত।

বর্ধমানের জমিদার কীতিচাঁদের দেওয়ান রামগোলাপ রায় (জাড়া রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা) মেদিনীপুর অঞ্চলের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। কীর্তিচাঁদ দেওয়ানের সহায়তায় চন্দ্রকোনা শহরে রামচন্দ্রের মূর্তিসহ একটি সুন্দর মন্দির ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ধমান-চন্দ্রকোনা পথে জাড়াতেও একটি ধর্মশালা ছিল; পুরীতীর্থ যাত্রীরা এই ধর্মশালায় বিশ্রাম লাভে সুযোগ পেত। এই রাস্তাটি বর্ধমান -উচালন - জাড়া - চন্দ্রকোনা হয়ে জাজপুরে পুরীগামী সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। বীরভূম জেলার নগোর (রাজনগর) হতে একটি রাস্তা দুবরাজপুর-নাকরাকোন্দা - উখরা - রানীগঞ্জ - ছাতনা - বলরামপুর - জনপুর - হরিহরপুর হয়ে বাল্মেরে পুরীগামী সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

প্রাচীনকালে পাটলীপুত্র হতে গঙ্গানদীর দক্ষিণ অববাহিকা ধরে একটি পথ তাম্রলিপ্ত হয়ে তোমলী পর্যন্ত বিজিত হয়েছিল। অতীতে উত্তরাপথের সঙ্গে পৌন্ড্রবর্দ্ধন ও কামরূপের যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে সার্থবাহ বা বনিক সম্প্রদায় দুই বলিবর্দবাহিত শকটে দলবদ্ধ হয়ে স্থল নিয়ামকের নিয়ন্ত্রনে ব্যবসা - বানিজ্যের কথা জানা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপথের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে প্রাচীন পথগুলিকে অনুসরণ করে শাসনকার্য, সামরিক অভিযান ও ব্যবসা - বানিজ্যের জন্য নূতন নূতন পথ অথবা প্রাচীন পথগুলির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে পাল ও সেন আমলে সুশৃঙ্খল রাজ্য শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে সেসময়ে রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মধ্যযুগে নির্মিত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন রাস্তাঘাটের নিদর্শন অধিক দেখা যায়। অবশ্য বহু খরস্রোতা নদী প্রবাহের ফলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে নির্মিত রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যা হউক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধ্যযুগে নির্মিত কিছু গুত্বপূর্ণ রাস্তার পরিচয় দেওয়া হল।

১. তবকাত - ই - নাসিরী হতে জানা যায় গিয়াস - উদ্ - দীন ইউজ খলজী দেবকোট হতে গৌড় হয়ে বীরভূম জেলার রাজনগরপর্যন্ত ৭৫ ক্রোশ বা ১৫০ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন।

২. দেবকোট হতে কামরূপ হয়ে করমবথন পর্যন্ত একটি রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার উপর পাথরের খিলান যুক্ত সেতু ছিল।

৩. ফকর - উদ্দিন মুবারক শাহের আমলে ইসলামাবাদ হতে চাঁদপুর পর্যন্ত একটি পথ নির্মিত হয়েছিল।

৪. লখনৌতি হতে মালদহ ও দিনাজপুর হয়ে লেকমর্দন - গোবিন্দপুর - রংপুর হয়ে কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত একটি পথ ছিল এবং এখান হতে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যেত।

৫. পূর্বোক্ত রাস্তা ব্যতীত অপর একটি পথে লখনৌতি - দেবকোট - রংপুর - কুড়িগ্রাম হয়ে রাঙ্গামাটি যাওয়া যেত।

৬. রংপুর হতে উত্তরমুখী একটি রাস্তা মঙ্গলহাট - বিহার (কোচবিহার) - বেনাগঞ্জ - বক্সাদুয়ার হয়ে ভূটান সীমান্তে পৌঁছেছিল।

৭. কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে শেরশাহের সময়ে সোনারগাঁও হতে নারায়নগঞ্জ-চাহসরাই (সারা) - ঢাকা - শেরপুর আতাই - শাহজাদপুর - শেরপুর মুর্চা - রামপুর বোয়ালিয়া (রাজসাহী) - নবাবগঞ্জ গৌড় - হোসেনপুর গঙ্গা পার হয়ে আগমহল (রাজমহল)- তেলিয়াগড়ি - ভাগলপুর - মুঙ্গের হয়ে পাটনা পর্যন্ত যাওয়া যেত। কটন সাহেবের মতে সোনারগাঁও হতে গৌড় পর্যন্ত পথটি শেরশাহ তৈরী করেছিলেন।

৮. নবাবগঞ্জ হতে একটি পথ সোজা উত্তরমুখে গিয়ে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে তাজপুর - পূর্ণিয়া-দ্বারভাঙ্গার

দক্ষিন - পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে হাজীপুর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

৯. নবাবগঞ্জ - দিনাজপুর - শিবগঞ্জ - বৈকুন্ঠপুর হয়ে তিস্তা নদীর তীরে ত্রান্তি পর্যন্ত একটি উত্তরমুখী রাস্তা ছিল।

১০. রামপুর বোয়ালিয়া হতে একটি রাস্তা শিবগঞ্জ - ঘোড়াঘাট - রংপুর - কোচবিহার হয়ে ভূটান সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

১১. মধ্যযুগে গৌড় হতে পুরী পর্যন্ত একটি গুত্বপূর্ণ রাজপথ বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত ছিল। গৌড়ের দক্ষিণ - পশ্চিমে গঙ্গা পার হয়ে সূতী পৌঁছান যেত এবং সুতী হতে গিরিয়া - পাঁচপাড়া - মির্জাপুর - মোরগ্রামন - সেরপুর - গয়েনপুর - ফতেপুর - সুন্দরপুর - নানুর - মঙ্গলকোট - কর্জনা - বর্ধমান - বুজকডিহি - উচালন - একলাখী - গড়মান্দ ারড় - ক্ষীরপাই - মেদিনীপুর - নারায়ণগড় - জল্মের - বাসতার - বাল্মের - ভদ্রক - জাজপুর - কটক - ভু বন্মের এবং তথ া হতে পুরী যাওয়া পথ ছিল।

১২. চতুর্দশ শতকে সপ্তগ্রামে ইক্তা বা শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানের গুত্ব বৃদ্ধি পায়। সপ্তগ্রামের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তন্মাধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ---

(ক) সপ্তগ্রাম - নয়াসরাই - অম্বিকা কালনা - সমুদ্রগড় - নবদ্বীপ - পাটুলী - ইন্দ্রনী - কাটোয়া এবং পাটুলীতে গঙ্গা পার হয়ে অপর একটি শাখা কাশিমবাজার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

(খ) সপ্তগ্রাম - পাণ্ডুয়া - সেলিমাবাদ - বর্ধমান - মঙ্গলকোট হয়ে কাটোয়া।

(গ) সপ্তগ্রাম - পাণ্ডুয়া - বর্ধমান - গড়মান্দারণ - নেড়াদেউল - জাজনগর - কটক - পুরী।

(ঘ) সপ্তগ্রাম - পাণ্ডুয়া - মহানদা - কৃষ্ণবাটী - ধনিয়াখালি - রাজবলাহাট - গড়মান্দারণে বাদশাহী সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

১৩. বর্ধমান হতে কালনা পর্যন্ত রাস্তাটি বর্ধমান রাজবংশানুচরিতে দাবী করা হয়েছে যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মহার াজা তেজচন্দ্র এইরাস্তাটি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই দাবী সঠিক নহে। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে এই রাস্তা চিহিত আছে। মোগল আমলের প্রাচীন পথটি তেজচন্দ্র সংস্কার করে রেশমকুঠি গুলিকে পান্থনিবাসে পরিণত করেছিলেন।

১৪. রাজনগর - সিউরী - মঙ্গলডিহি - দেউলী - কর্ণগড় - আউসগ্রাম - দিগনগর- গোহগ্রাম (দামোদর পার হয়ে) ইন্দাস - বদনগঞ্জ - চন্দ্রকোনা - ঔরঙ্গবাদ হয়ে মেদিনীপুরে বাদশাহী সড়কে মিশেছিল।

১৫. দামোদরের দক্ষিণতীরে পলাসডাঙ্গা হতে একটি রাস্তা সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর অতিত্রম করে ফুলবাড়ী - রসকুণ্ড - আমিনপুর- শিরনা হয়ে মেদিনীপুরে পূর্বোত্ত রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

১৬. সপ্তগ্রাম হতে হুগলী - শ্রীরামপুর - বালী - সালকিয়া - কোলকাতা- বাইপুর হয়ে কুলপী পর্যন্ত রাস্তাটি দ্বা রির জাঙ্গল নামেপরিচিত ছিল। এখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দ্বারির জাঙ্গালের অস্তিত্ব আছে।

১৭. সালকিয়া হতে তান্না দুর্গের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী একটি বড় রাস্তা আমতা হয়ে দক্ষিণ - পশ্চিম দিকে ন ামকুর - গোপালনগর - খন্যাডিহি - নবাবগঞ্জ - গোলগ্রাম- কাপাসটিকরী - বোগরাই - দোগাদি হয়ে মেদিনীপুরে বাদশ াহী সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

১৮. প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হতে একটি রাস্তা ময়নাগড় হয়ে শ্যামপুরের দক্ষিণ - পশ্চিমে আকুন্তলা বা অ ামড়াতলা - শিউলীপুর - অমর্ষি - পটাসপুর - সাউরী - তুর্কা - কিড়হার হয়ে জল্মেরে বাদশাহী সড়কের সঙ্গে মিশেছিল।

১৯. তমলুক - ময়নাগড় - শ্যামপুর - দুররাজপুর - কেদার হয়ে মেদিনীপুরে বাদশাহী সড়কে মিশেছিল।

২০. মসনদী ওয়ালার রাজপট ছিল হিজলীতে। হিজলী হতে একটি রাস্তা পিপলি হয়ে জল্মের পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

২১. সালকিয়া হতে রাজাপুর - রাজবলহাট - জাহানাবাদ (আরামবাগ) কোতলপুর - বিষ্ণুপুর - ছাতনা - রঘুনাথপুর - বিরা - চরপোতা - কোড়া - সোনাবাদ হয়ে রামগড়ে যাওয়া যেত। রামগড় হতে একটি উত্তরমুখী রাস্তা ধরে নওধা - বিহার সরিফ হয়েপাটনা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। রঘুনাথপুর থেকে পাঁচেৎ হয়ে অপর একটি রাস্তা ধরে

সেরপুর - কোরকডিহি হয়ে পাটনা যাওয়া পথ ছিল।

২২. হুগলী হতে মালিপাড়া - ধনিয়াখালি - বালিডাঙ্গা - কাঁসরা - শ্রীকৃষ্ণপুর - সেহারা - ইন্দাস- সোনামুখী - অশুরা - নরবংধা - শালতোড়া হয়ে রঘুনাথপুর ও পাঁচেৎ যাওয়ার পথ ছিল।

২৩. ধনিয়াখালি হতে একটি রাস্তা বৈঁচি - কুমিরপাড়া - কালনা - রাইপুর - মরাউপিড়ি - মাহমুদপুর - মন্ত্রেশ্বর হয়ে নিগন -এ বর্ধমান - কাটোয়া রাস্তার সঙ্গে মিশেছিল।

২৪. সমুদ্রগড় - লস্করা পাড়া - মুকসিম পাড়া - বাকসা হয়ে একটি ছোট রাস্তা ধরে কাটোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই রাস্তাটি ভত্তিখাঁ রোড নামে পরিচিত ছিল। বাকসা হতে অপর একটি রাস্তা ধরে নিগন যাওয়া যেত। বর্তমান এই রাস্তার কোন নিদর্শন নেই।

২৫. (ক) কালীঘাট হতে একটি রাস্তা বীরনগর (বরানগর) -বারাসত - জানবেড়িয়া - মল্লিকপুর - চাঁদপাড়া - বনগ্রাম - মুড়লী (যশোহর) - মামুদপুর - জয়নগর - ছয়নাগঞ্জ -এ পদ্মানদী অতিত্রম করে ঢাকা পৌঁছান যেত।

(খ) জয়নগর হতে অপর একটি রাস্তা ধরে হুকুমপুরের কাছে পদ্মা নদী পার হয়ে পরপারে বীরনগর হতে রাজাবাড়ীতে মেঘনা নদ অতিত্রম করে চাঁদপুর যাওয়া যেত। চাঁদপুর হতে লক্ষ্মীপুর - কালিন্দা হয়ে রাস্তাটি উসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল

(গ) 'ক' চিহিত রাস্তা ধরে ঢাকা হতে দক্ষিণে মেঘনা অতিত্রম করে গোপালনগরের মধ্য দিয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত একটি পথ ছিল।

(ঘ) ঢাকা হতে অপর একটি রাস্তা ধরে নরসিঁদিতে মেঘনা পার হয়ে ঘাসীপুর - দৌলতপুর - লক্ষ্যা - সুজতপুর - ডিমাব াজার - শ্রীহট্ট হয়ে জয়ন্তীপুর যাওয়ার একটি রাস্তা ছিল।

মধ্যযুগে নির্মিত রাস্তাঘাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-একটি সেতুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত শিলহাকে াটের সেতুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ নৈহটী - সীতাহাটি গ্রাম সংলগ্ন শিবা নদীর উপরঅপর একটিসেতুর নিদর্শন দেখা যায়। ভগ্ন সেতুটি প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ পাঁচ খিলান বিশিষ্ট, সুদৃঢ় ইষ্টক নির্মিত, যার গঠন বৈশিষ্ট্য একালেও বিস্ময় উৎপাদন করে। পরিত্যক্ত সেতুর দু'পাশের রাস্তা অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেতুর গাঁথুনী এত শক্ত ছিল যে সাধারণ শ্রমিকেরা ঐ সেতু ভেঙ্গে রাস্তার জন্য ইট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হওয়ার সেতু ভাঙ্গার কাজটি পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং সেতুর গায়ে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি থেকে এ প্রমাণ তাঁরা দাবী করেন। কিন্তু শিলালিপির সন্ধান না পাওয়ায় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; তবেসেতুর গঠন বৈশিষ্ট্য, নির্মান কুশলতা ও ইটের ব্যবহার প্রণালী দেখে অনুমান করা যায় যে, ইহা মোগলযুগে কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। শিবানদী বা কাঁদড় খালটিকে বল্লালসেনের নৈহাটী সীতাহাটী তাম্রশাসনে উল্লিখিত সিঙ্গুটিয়া নদী বলে অনুমান করা হয়। সেতুটি স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট 'মাসীর সেতু' নামেই সমধিক পরিচিত।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় ও বানিজ্যিক প্রয়োজনে বহু পথঘাট নির্মিত হলেও খরস্রোতা নদীবহুল ও বন্যাপ্রবণ বঙ্গদেশে সে সকল পথের বহু নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উপাদন ব্যতীত মধ্যযুগে নির্মিত বহু রাস্তাঘাটের নিদর্শন জেমস্ রেনেলের মানচিত্রে চিহিত আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এদেশে রাস্তাঘাট নির্মণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। সুতরাং রেনেলের বঙ্গদেশ এগার বৎসর অবস্থানকালীন সময়ে যে সকল পথঘাটের পরিচয় পাওয়া যায় তার কোনটাই ইংরেজরা তৈরী করেনি। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে সুদীর্ঘ সাড়ে পঁ াচশ বছর ধরে মুসলমান শাসক ও স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ যেসকল রাজপথ ও সাধারণ পথঘাট তৈরী করেছিলেন সে সকল রাস্তাঘাট মধ্যযুগে ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা যায় এবং রেনেলের মানচিত্রে তাই চিহিত আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com